

পলিটেকনিকে এক আসনে পড়ছে পাঁচ শিক্ষার্থী

শরীফুল আলম সুমন >

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১১টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে অনেক বিভাগেরই একাধিক সেকশন রয়েছে। কয়েক বছর আগে প্রতিটি সেকশনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ থেকে বাড়িয়ে ৪৮ জন করা হয়। কিন্তু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়ালেখা মূলত ব্যবহারিকনির্ভর। প্রতিটি অনুপস্থিতির সুযোগে কোনোমতে এত দিন ক্লাস চালিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই এবার প্রতি সেকশনে ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির নির্দেশনা আসে। শুধু তাই নয় ১১টি বিভাগে আরো ৯টি সেকশনও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ শিক্ষার্থী বসার জায়গা নেই, শিক্ষক আছে আগের মতোই। শুধু তাই নয়, দুই শিফটেই এক

কারিগরি শিক্ষার বেহাল
দুই শিফটে পিষ্ট
শিক্ষকরাও

ক্লাস শুরু হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজ ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১১টি বিভাগের মধ্যে সিলিভ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চারটি সেকশন, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দুটি করে সেকশন এবং ইলেকট্রনিক, কম্পিউটার, এনভায়রনমেন্ট, আর্কিটেকচার, অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেশন, ফুড ও কেমিক্যাল

অবস্থা। এক শিফটের শিক্ষকদেরই ডাবল শিফট পরিচালনা করতে হয়। ফলে ক্লাস্ত শিক্ষকরা একগাদা শিক্ষার্থীর পড়ালেখায়ও সেভাবে মনোযোগ দিতে পারছেন না। এ অবস্থার মধ্যেই আজ মঙ্গলবার চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্সের শিক্ষার্থীদের রাস শুরু হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজ ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১১টি বিভাগের মধ্যে সিলিভ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চারটি সেকশন, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দুটি করে সেকশন এবং ইলেকট্রনিক, কম্পিউটার, এনভায়রনমেন্ট, আর্কিটেকচার, অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেশন, ফুড ও কেমিক্যাল

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

শেষ পৃষ্ঠার পর
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে একটি করে সেকশন রয়েছে। আর এসব সেকশনে চলতি শিক্ষাবর্ষে তিন হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে।

ভর্তি হওয়া তিন হাজার শিক্ষার্থীরই ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয় দুটি রয়েছে। অথচ তাদের জন্য ফিজিক্স ল্যাব একটি, কেমিস্ট্রি ল্যাব একটি। এ অবস্থায় একজন শিক্ষার্থী মাসে একবারের বেশি ওই বিষয়গুলোর ল্যাব ব্যবহারের সুযোগ পায় না। এ ছাড়া ঢাকা পলিটেকনিকে কনস্ট্রাকশন ল্যাব, হাইড্রোলিক ল্যাব ও টেস্টিং ল্যাবও একটি করে। অথচ সিভিল, আর্কিটেকচার ও এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্যও একই ল্যাবের প্রয়োজন হয়। ফলে এক বিভাগের শিক্ষার্থীরা ল্যাবে গেলে অন্য বিভাগ সুযোগ পায় না। আবার যেহেতু ডাবল শিফট তাই শিক্ষকদের পক্ষেও বেশি সময় দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ অন্য শিফটের শিক্ষার্থীরা আগেই এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ গণেশ চন্দ্র মজুমদার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ফিল্ডের অভিজ্ঞতা মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর নেয় না। আমাদেরকে শিক্ষার্থী চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ক্লাসরুম ডিজাইন করা ৪০ জনের জন্য, এখন বসাতে হবে ৬০ জন। এর উত্তরে আমাদের কর্তৃপক্ষ বলে, বাংলা কলেজে সাড়ে ৩০০ শিক্ষার্থী একসঙ্গে ক্লাস করে, আপনারা ৬০ জন করতে পারবেন না? এর উত্তরে আমরা কিভাবে দেব? সাধারণ আর কারিগরি শিক্ষা যে এক নয় সেটা বুঝতে হবে। সরকার ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরিতে মোট শিক্ষার্থীর ২০ শতাংশ আনতে চায়। তাই সমস্যার মধ্যেও শিক্ষার্থী বাড়ানো হয়েছে। এখন আমরা আশায় আছি, কখন আমাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।'

দেশের মানদণ্ড পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হিসেবে ধরা হয় ঢাকা পলিটেকনিককে। এ প্রতিষ্ঠানেরই যখন এই অবস্থা তখন অন্যান্য পলিটেকনিকের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। দেশের অন্যান্য পলিটেকনিকের ল্যাব ও শিক্ষক সংকট আরো ভয়াবহ। সংশ্লিষ্টরা বলেন, হাতেকলমে শিক্ষার নাম কারিগরি শিক্ষা। কিন্তু এখন যে পরিমাণ শিক্ষার্থী তাতে হাতেকলমে পড়ালেখার সুযোগ আর নেই। প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অবকাঠামো না বাড়িয়েই বছর বছর বাড়ানো হচ্ছে শিক্ষার্থী। আগের বছরগুলোর শিক্ষার্থীরা যতটুকু ব্যবহারিক ক্লাস করার সুযোগ পেত, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে সেই সুযোগও পাবে না। ফলে হঠকারী সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থী বাড়লেও শিক্ষার মান বাড়বে না বরং কমবে।

কারিগরি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক হিদ্রিস আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কারিগরিতে শিক্ষার্থী বাড়ানোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও বাড়ানো দরকার। দেশের প্রায় সব পলিটেকনিকেই ল্যাবরেটরির সংকট রয়েছে। এর পরও চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থী বাড়ানো হয়েছে। তাই দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করা দরকার। আর অস্থায়ী শিক্ষক দিয়ে শিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব নয়। সেদিকটাও সরকারকে নজর দিতে হবে।'

জানা যায়, দেশের ৪৯ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১২ হাজার ৫২৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ ছিল। কিন্তু শিক্ষক না বাড়িয়ে প্রতিটি পলিটেকনিকেই ডাবল শিফট করা হয়েছে। ফলে কয়েক বছর ধরে প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করে হচ্ছে। এ অবস্থায়ও শিক্ষকরা কোনো রকমে পাঠদান করিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু চলতি বছর হঠাৎ করে ফের শিক্ষার্থী বাড়ানোর পাশাপাশি দেশের ৬৪টি সরকারি কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে এবং বগুড়া ভোকেশনাল টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটেও চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয়েছে। কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই এই ৬৫টি প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। চলতি বছর শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়েছে ৫৭ হাজার ৩০০ জন। সব প্রতিষ্ঠানে একযোগে ডিপ্লোমা কোর্স খুলতে গিয়ে যখন যে বিষয় নেই সেখানেও তা খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষকের দ্বাভাবে ক্লাসই করতে পারছে না কিছু প্রতিষ্ঠান। মানিকগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ নেই। অগাধ

অ্যাড কলেজের অধ্যক্ষ আখেরুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানে সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং খোলা হয়েছে। তবে আমাদের সিভিল বিভাগ নেই। মূলত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনার জন্য আমাদের কিছুই নেই। ভবন, শিক্ষক, ল্যাবরেটরিসহ নানা বিষয়ে আমরা চাহিদা পাঠিয়েছি। প্রথম দিকে কিছুটা থিওরিটিক্যাল পড়ালেখা আছে। সেগুলো চালিয়ে নিতে পারব। কিন্তু এর পরের পড়ালেখার জন্য আমাদের চাহিদা অনুযায়ী সাপোর্ট দিতে হবে।' সুত্র জানায়, শিক্ষার্থী বাড়ানোর এমন পরিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দিয়েছেন কারিগরি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস। তিনি মূলত একটি সিন্ডিকেটের বিপরীতে পাঁচজন শিক্ষার্থী ভর্তির এই বৃদ্ধি দিয়েছেন। তাঁর এই বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করে মহারিপদে আছে মন্ত্রণালয়। তারা ভর্তিও বাতিল করতে পারছে না, আবার হঠাৎ করে অবকাঠামো ও ল্যাবরেটরি সুবিধাও বৃদ্ধি করতে পারছে না। কারিগরি অধিদপ্তরের এই মহাপরিচালক একসঙ্গে দুটি পদ দখল করে রেখেছেন। তিনি মন্ত্রণালয়েরও অতিরিক্ত সচিব, আবার অতিরিক্ত হিসেবে কারিগরি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্বও পালন করছেন। ফলে তিনি কোনো দিকেই ঠিকমতো সময় দিতে পারছেন না। অথচ এত দিন ধরে এই অধিদপ্তরে কারিগরির সিনিয়র অধ্যক্ষদের মধ্য থেকেই মহাপরিচালক বানানো হতো, যারা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকেই এই অধিদপ্তর পরিচালনা করতেন। কিন্তু এখন কারিগরি শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার আলোকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও কারিগরি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাসকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। তবে মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (কারিগরি) সুবোধ চন্দ্র ঢালী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কারিগরিতে শিক্ষার্থী বাড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। সে জন্যই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি খাতে আরো ১২টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকারও এই প্রকল্পগুলোর ব্যাপারে আন্তরিক। এসব প্রকল্প পাস হলে এর অধীনে অবকাঠামো, ল্যাবরেটরি, শিক্ষকসহ নানা সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।' কিন্তু এই প্রকল্পগুলো কবে থেকে শুরু হবে এর কোনো সন্দেহ পাওয়া যায়নি।

জানা যায়, অস্থায়ী শিক্ষক দিয়েই চলছে সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। শিক্ষকদের দুই হাজার ১০৭টি শূন্য পদের বিপরীতে ২০১৪ সালে ক্লিন্স অ্যান্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে এক হাজার ৪৭ জন এবং ক্লিন্স ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত এই শিক্ষকদের মেয়াদ ছিল। চলতি বছর তাঁদের মেয়াদ ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। অস্থায়ী ভিত্তিতে এসব শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ায় তাঁদের কাছ থেকে যথাযথ শিক্ষা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। তাঁদের তেমন প্রশিক্ষণও নেই। আবার তাঁদের চাকরি অস্থায়ী হওয়ায় বর্তমান প্রতিষ্ঠানে নজর না দিয়ে অন্য চাকরি খুঁজতে বাস্তব হয়ে পড়েছেন তাঁরা। যারাই ভালো সুযোগ পাচ্ছেন তাঁরাই চলে যাচ্ছেন। বর্তমানে ৮৩৬টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষার্থী হিঙ্গনেরও বেশি বাড়ানোর পরও এই শূন্য পদ পূরণেরও কোনো উদ্যোগ সরকারের নেই। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় শূন্য পদগুলোতে অস্থায়ী শিক্ষকদের উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁরা সদ্য ডিপ্লোমা পাস। জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর হিসেবে স্থায়ী শিক্ষকরা ২০ বছর ধরে চাকরি করছেন। অথচ সদ্য পাস করাদের অস্থায়ীভাবে বসানো হয়েছে ইন্সট্রাক্টর হিসেবে। এতে স্থায়ী শিক্ষকদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বও তৈরি হয়েছে। অস্থায়ী শিক্ষক দ্বারা উচ্চ পদগুলো পূরণ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করেও স্থায়ী শিক্ষকরা পদোন্নতি পাচ্ছেন না। শিক্ষকদের মধ্যে এ ধরনের দ্বন্দ্বের প্রভাবে ব্যাহত হচ্ছে পড়ালেখাও।

জানা যায়, এশিয়ার মধ্যে দ্রুত উন্নতি করা সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার উন্নয়নের প্রধান শর্ত হিসেবে ধরা হয় কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন। সিঙ্গাপুরে এই শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশ ও মালয়েশিয়ায় ৪০ শতাংশ। বাংলাদেশে এই শিক্ষায় শিক্ষিতের হার সরকারি ১৪ শতাংশ দাবি করলেও বাস্তবে তা আরো কম। যদিও সরকার ২০২০ সালের মধ্যে